112

আজকের কাগজ

তারিখ ... 11 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গন ঃ সন্ত্রাস ও সহিংসতার বছর

তারিক রিজভীঃ শেষ হলো '৯৫ সাল। শিক্ষাঙ্গনের প্রতিটি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক নতুন বছরকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন সাজিয়েছিলো। আশা করেছিলো এ বছরটি জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে লেখা-পড়া, জ্ঞানচর্চা, আর সাহিত্য সংস্কৃতির উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজমান থাকবে। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। '৯৫ সালের সফল খল নায়ক জামাত-শিবির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ নিতে দেয়নি। শুরুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এরপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সন্ত্রাসী থাবা বিস্তার করেছে। পুরোনো আস্তানা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থাবা প্রসারিত করেছে চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে। ৭১-এর পর ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাফল্য ঈর্ষণীয়। দখল পক্রিয়ায় তারা এখন শীর্ষে। জামাত-শিবিরকে পুনর্বাসনের পর সন্ত্রাসী ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী' এই মূলমন্ত্রই ওদের সাফল্যের চাবি কাঠি। দেশের শিক্ষাঙ্গনে জামাত-শিবির নতুন এক ধারার জন্ম দিয়েছে। হাত,পা ও ঘাড়ের রগকাটা। এই সংগঠনটিই এদেশের ছাত্র রাজনীতিতে পুনঃপ্রবর্তন করেছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নৃশংসতার। অবশ্য শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ দূষিত করবার জন্যে একমাত্র জামাত-শিবির দায়ী, তা নয়। ১৯৯৫ সালে সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নিহত হয়েছে ৩২ জন, আহত হয়েছে দু'হাজারেরও অধিক, সংঘর্ষ হয়েছে প্রায় আড়াইশ'টি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। '৯৫ সালে এখানে নিহত হয়েছে দু'জন। মৃত্যুবরণ করেছেন তিন জন। নিহত দু'জনেই (জাকির, বাপ্পী) ছাত্রলীগের কর্মি। সংগঠনের আভ্যন্তরিণ কোন্দলই তাদের মৃত্যুর কারণে। এ বছরের সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে ২৬ ডিসেম্বর। ঢা.বি অর্থনীতি বিভাগের তরুণ শিক্ষক নুবান আহমেদ এ দিন মৃত্যুবরণ করেছেন। কতিপয় সন্ত্রাসী তাকে মারাত্মকভাবে আহত করলে হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য ভবন নিয়ে টেন্ডারবাজি ছিল '৯৫-এর একটি আলোচিত বিষয়। ৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিলো। পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য ভবন নির্মাণের জন্যে। কিন্তু নির্মাণ কাজ শুরু হতে পারেনি প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসের কারণে। ৫০ লাখ টাকা চাঁদা হিসেবে দাবি করেছিলো তারা। পরে ২৬ অক্টোবর উপাচার্য কর্তৃক এ টেন্ডার বাতিল ঘোষণা করা হয়। '৯৫-এ জামাত-শিবির চক্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও থাবা প্রসারিত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। প্রথম ধাপ হিসেবে ওরা বেছে নিয়েছিলো রোকেয়া হলকে। জানা গেছে, গত ৯ নভেম্বর এখানে জামাত-শিবির দু'জন বিদেশিনীর উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত করেছিলো। কিন্তু জামাত-শিবিরের এ কার্যক্রম সফল হয়নি সচেতন ছাত্রিদের প্রতিবাদের মুখে। যদিও রোকেয়া হল কর্তৃপক্ষের মতে সেদিন ওখানে জামাত-শিবিরের কোনো সভা হয়নি। হয়েছে তবলীগ জামাতের। এ ক্ষেত্রে সচেতন ছাত্রিরা বলেন, তবলীগ জামাতের অনুষ্ঠান হলে কেনো মাত্র ১৫/২০ জন ছাত্রিকে নিয়ে সভা হলো, কেনো সভার কথা সবাইকে বলা হলো না। '৯৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রিরা একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছে তা হলো 'সান্ধ্য' আইন বাতিল। ১০ ফেব্রুয়ারি প্রথম বারের মতো সান্ধ্য আইন বাতিলের দাবি জানানো হয়। এ আন্দোলনের এবং সফলতার জন্যে অবশ্যই বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রশংসার দাবিদার। কেননা ছাত্র ইউনিয়ন এ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। '৯৫-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে কলংকজনক ঘটনা হচ্ছে শিশু অপহরণ। ৬ নভেম্বর শিশু অপহরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ঢা.বি ছাত্র আসাদুজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

গত ১৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দখলের পরিকল্পনা করেছিলো জামাত-শিবির। কিন্তু বিজয় দিবসের প্রত্যুষে '৭১-এর পরাজিত ঘাতকের সহযোগিদের কাছে মাথা নত করেনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। সর্বদলীয়ভাবে ১২ ঘন্টা সর্বাত্মক প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয় ছাত্র শিবির। সেদিন ওদেরই গুলিতে সেমসাইড হয়ে নিহত হয়েছে ৪ জন শিবির কর্মি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাত-শিবির প্রথম সংঘর্ষ ঘটায় ৯ ফেব্রুয়ারি। ছাত্র শিবিরের গাইড বিক্রিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে সেদিন নিহত হয়েছিলো একজন। আহত হয়েছিলো অর্ধশতাধিক। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছিলো এক মাসের জন্যে।

দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি শেষে '৯৫-এর ৯ নভেম্বর জামাত-শিবির জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আলবেরুনী ও কামাল উদ্দিন হলে গভীর রাতে হানা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দখলদারিত্ব। কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রিদের প্রতিরোধ ও পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায় ওরা নয় ঘন্টা পর হল ছাড়তে বাধ্য হয়। গ্রেফতার করা হয় ৩৭ জন শিবির কর্মিকে। শিবির চক্র বর্তমানে সাভার, আমিন বাজার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রামগুলোতে ঘাপটি মেরে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলো বাইরে এলেই ভাঙচুর করছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চলতি বছর ছাত্র শিবিরের সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের তিন দফা বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়েছে। বছরের প্রায় ছয় মাস বন্ধ ছিলো এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানেও বন্ধ আছে। রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ে শিবির প্রথম আঘাত হানে ১১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন শিবির কর্মিরা হল ভাঙচুর, নোট, বই-পুস্তক এক কক্ষে অগ্নিসংযোগ এবং অর্ধশতাধিক ছাত্রকে আহত করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি জামাত-শিবির তিনজন ছাত্রকে হত্যা করে। নিহতরা হলেন, মুস্তাফিজুর রহমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং দেবাশীষ ভট্টাচার্য রূপম। ছাত্রমৈত্রী নেতা রূপম পাবনায় তার বাসায় যাচ্ছিলেন। সে সময় বিনোদপুর নামক স্থানে শিবির কর্মিরা বাস থামিয়ে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে।

এরপর ২-এর পাতায়

শিক্ষাঙ্গন ঃ সন্ত্রাস ও সহিংসতার বছর

শেষের পাতার পর

এক জরিপে জানা যায়, স্বাধীনতার পর বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গন সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস কবলিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সন্ত্রাস নির্মূলে কোনো ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা হয়েছে প্রায় ১০০ মিনিট। এক মিনিট সংসদ অধিবেশন চালাতে খরচ হয় ৩ হাজার টাকা। এই হিসেবে সংসদে শুধু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা করে জাতীয় অর্থের ১৮ কোটি টাকা অপচয় করা হয়েছে। কিন্তু লাভের খাতা শূন্য।

দেশের অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনের দিকে তাকালে দেখা যায়। '৯৫-এর ২ নভেম্বর ঢাকার জগন্নাথ কলেজকে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর রংপুর মেডিক্যাল কলেজের একদল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ (কা-চু) নেতা আনোয়ারের বাসায় বোমা হামলা করলে তার বৃদ্ধ পিতা জমসের আলী নিহত হন। একই দিনে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্র-শ্রমিক সংঘর্ষে ২২ জন আহত হয়। ১৪ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে অস্ত্রসহ আটজন শিবির কর্মিকে গ্রেফতার করা হয়। সাত জানুয়ারি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে অবিরাম ধর্মঘট আহবান করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট শুরু হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি শিবির কর্মিরা খুলনায় ছাত্রদল নেতা আবুল কালাম আযাদ (২৬)কে খুন করে।

১৯৯৫ সালে (শিক্ষাঙ্গন) এমনি সংঘর্ষ, খুন ঘটেছে অহরহ। এসব ঘটনার প্রধান খল নায়ক ছিলো জামাত-শিবির। '৫২-এর ভাষা শহীদ, '৭১-এর শহীদ এবং জীবিত মুক্তিযোদ্ধা, '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নিহত, আহত এবং আন্দোলনের যাবতীয় কর্মিরা আমাদের কাছে অমর এবং শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই আমাদের চিহ্নিত করা উচিত এদেশের স্মৃতিব্যক্তিদেরকে। সেক্ষেত্রে সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহবান, আসুন আমরা গোলাম আযম, আর ঐসব নেতা-নেত্রীকে আজন্ম ঘৃণা করতে শিখি যারা নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে ধরিয়ে দেয় অস্ত্র। অস্থির করে রাখে শিক্ষাঙ্গন।